যুগান্তর

তারিখ 13 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বদরুদ্দীন উমর

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে

৩১ মে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে ইতিপূর্বে শিক্ষা কমিশন ইত্যাদি গঠন করা হলেও এই প্রথম কোন সরকার কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটিও ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে।

এই শিক্ষানীতি বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের মন্তব্যও এরপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তারা সাময়িকভাবে এই শিক্ষানীতিকে ইতিবাচক বলে বর্ণনা করে এর বাস্তবায়নের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এই বিশাল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আর্থিক এবং অবকাঠামোগত নানা সমস্যার কারণে সম্ভব হওয়ার বিষয়ে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. খলীকুজ্জমান আহমদ বলেছেন, এ নীতি বাস্তবায়নে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার জোগান পেতে অসুবিধা হবে না, যদি সরকার তার প্রতিশ্রুতি মতো শিক্ষা খাতে জিডিপির সাড়ে ৬ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ দেয়। এমনকি যদি ৪ শতাংশও দেয়, তাতেও কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে।

১০ জুন পেশকৃত ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে অবশ্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্টভাবে কোন অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়নি। তবে এই নীতি বাস্তবায়ন কতখানি ও কিভাবে হবে, এ আলোচনা ছাড়াও এই নীতির কয়েকটি দিক নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে প্রায় প্রতিটি সরকারই এক একটি শিক্ষা কমিশন ঘোষণা করলেও তার কোনটির সুপারিশই আজ পর্যন্ত কার্যকর বা বাস্তবায়িত হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে তা অবৈতনিক করাও সরকারের দিক থেকে বাধ্যতামূলক। মনে রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও স্কুলপর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে আগেকার বেতন, ফি ইত্যাদি বকেয়া ধরে পরে আদায় করা হয়েছিল।

কোন একটা নীতি রাতারাতি ঘোষণা করলেও তা কার্যকর কিভাবে হবে, তার কোন হিসাব সাধারণত সরকারের থাকে না। কাজেই নীতি ঘোষণার পর তা বাস্তবায়ন নিয়ে যে সমস্যা হয়, তার পরিণতিতে নীতিই পরিত্যক্ত হতে দেখা যায়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করে তাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এই নীতির ঘোষণা কতখানি বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করে এবং কতখানি দলীয় প্রচারণার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে— সেটাই দেখার বিষয়। কারণ এ ধরনের সরকার কোন কাজ করার চেয়ে সেই কাজের কথা বলে আত্মপ্রচার ও নিজের মহিমা কীর্তনের জন্যই সবকিছু করে থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ে শিক্ষাকে বিশেষায়িত করার কথাও আছে। অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হতো। বর্তমানে সেই বিভক্তি নিম্নপর্যায়ে নামিয়ে এনে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি করা হচ্ছে। কারণ একজন ছাত্র কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে পড়াশোনা করবে অর্থাৎ নিজের বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্র নির্বাচন করবে, সেটা বুঝে উঠতে সময় লাগে। এজন্য তার শিক্ষার প্রাথমিক ভূমি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। এজন্য অন্তত দশম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্য অনুযায়ী তার পাঠ নেয়া দরকার। এ বিষয়টির গুরুত্ব মাননীয় শিক্ষা কমিশন সদস্যরা অর্থাৎ দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদরা বিশেষ বোধ করেন বলে মনে হয় না। কারণ অষ্টম শ্রেণীর পর বিশেষায়ণের এই নীতির বিরোধিতা করে কারও কোন মতামত আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। বর্তমান শিক্ষা কমিশনও সেই অভিন্ন নীতি বহাল রেখেছে এবং তা নিয়ে কোন শিক্ষাবিদেরই কোন উচ্চবাচ্য নেই। কাজেই কাঁচা বয়সে এবং শিক্ষার ভূমি একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত তৈরি না হওয়ার আগেই এভাবে ছাত্রদের গ্রুপে বিভক্ত করার পর দুই ধরনের ক্ষতি হয়। প্রথমত, তাদের সাধারণ শিক্ষা যতদূর ও যত বিষয়ে হওয়া দরকার, সেটা হয় না। দ্বিতীয়ত, নিজেদের বিশেষ বিষয় নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল করে বসায় পরবর্তী শিক্ষাজীবনে ছাত্রছাত্রীদের তার খেসারত দিতে হয়।

শিক্ষা কমিশন ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষাদানের কথা বলেছে। শিক্ষাবিদরা তাদের স্তরেও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষার পার্থক্য এই যে, তা বক্তৃতা দিয়ে বা পাঠ্যপুস্তকে তার ওপর আলোচনা দিয়ে কোন কাজ হয় না। নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন দৃষ্টান্ত। যারা অনৈতিক শিক্ষার কথা বলছেন, তারা যদি নানা ধরনের অনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে নিজেরা জড়িত থাকেন, তাহলে অন্যদের নৈতিক শিক্ষার কথা বললে তার দ্বারা ফললাভ হয় না, হতে পারে না। কাজেই 'সদা সত্য কথা বলিবে'র মতো উপদেশ বাণী পাঠ্যপুস্তকে ঢুকিয়ে নিজেরা মিথ্যার সাগরে নৌকো ভাসিয়ে চললে তার দ্বারা অন্যদের নৈতিক উন্নতি হয় না। উপরন্তু সমাজে এই ধরনের অনৈতিক আচরণের প্রাধান্য ও সার্বজনীনতা দেখে অনৈতিক কাজের প্রতিই তাদের ঝোঁক বাড়ে। বাংলাদেশে এটাই হয়েছে এবং এ কারণেই মনে করা হচ্ছে যে, পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বাণী বিস্তার করে এই প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু এদিক দিয়ে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক, এর পরিবর্তন শিক্ষা কমিশন যেভাবে সম্ভব মনে করেছে, সেভাবে সম্ভব নয়।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ ও বিশ্ব শিক্ষার অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হবে। এখানে দেখা যাবে, দীর্ঘদিন আগে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস বিষয়কে পাঠ্যতালিকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী ও সাধারণভাবে জনগণের সঙ্গে আমাদের নিজেদের ইতিহাসের কোন পরিচয় নেই। তারা কিছুই জানে না। একটা জাতির জন্য এর থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এটা প্রত্যেকটি সরকার নিজেদের হীন দলীয় প্রচারণা এবং দলীয় নেতাদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই করে এসেছে। এখন শিক্ষা কমিশনও সেটাই করার সুপারিশ করেছে। তাদের সুপারিশে ইতিহাস পাঠের কোন ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশ ও বিশ্ব নামে যে বিষয়টি রাখা হয়েছে, তাতে আমাদের দেশের প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিককালের ইতিহাস বলে কিছু নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আজ অনেক গালভরা কথা, যেগুলো একেবারে নগ্ন ক্ষমতায় আসার পর নিজেদের প্রয়োজনমতো সাজিয়ে নেয়। এসব শিক্ষা থেকে ছাত্রছাত্রীদের কোন শিক্ষা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য।

১২.৬.২০১০